যিশুর মৃত্যু রহস্য

ওয়াহিদ রেজা

এমন ঢাকা কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না,
এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা জানা যাবে না।
-যিশু খ্রিস্ট

> 'জ্ঞানী কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এ যুগের বাদানুবাদকারী কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের (মানুষের) জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নি? কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানকে যখন নিজের জ্ঞান দ্বারা মানুষ জানতে পারেনি, তখন প্রচারের মূর্খতার মাধ্যমেই বিশ্বাসীদের উদ্ধার করতে ঈশ্বরের ইচ্ছা হলো। কেনোনা ইহুদিরা প্রমাণ চায় এবং গ্রিকরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে আর আমরা ক্রুশে নিহত যিশুকে প্রচার করি।'...[১]

ঠিক এইভাবে, ধূর্ত সেন্ট পল-এর মিথ্যাচারিতার মধ্য দিয়ে প্রায় দু'হাজার বছর আগে প্যালেস্টাইনে শুরু হয়েছিলো খ্রিস্টধর্মের যাত্রা। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, সত্যিকারভাবে ক্রুশে যিশুর মৃত্যু হয়নি। ক্রুশবিদ্ধাবস্থায় তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামে আজগুবি, গাঁজাখুরি বিভিন্ন গপ্পো ফেঁদে, জীবিত যিশুকে মৃত বানিয়ে, তাঁর মড়াকে খাড়া করে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন চালিয়া খ্রিস্টপাণ্ডা-পুরুতগণ। একজন রক্তমাংশের মানুষকে ঈশ্বরের পুত্র বানিয়েছেন তারা। শুধু তাই নয়; ঈশ্বর এবং যিশু উভয়কে একত্রিত করে তারা বলে বেড়ান-'চিরশান্তিদাতা যিশু মানেই ঈশ্বর; ঈশ্বর মানেই যিশু-ক্রুশবিহীন-পরিত্রাণ নেই।' অথচ সেই ত্রাণকর্তা, চিরশান্তিদাতা যিশুই কিনা বাইবেলে বলেন [২],

> 'মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; না, শান্তি নয়, তরবারি দিতে এসেছি। আমি তো এসেছি ছেলেকে তার বাপের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে, মেয়েকে তার মায়ের বিরুদ্ধে, বউকে তার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে। মানুষের শত্রু হয়ে উঠবে তার নিজের ঘরেরই লোকেরা। যে নিজের বাবাকে বা মাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সে আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়। আর যে নিজের ছেলেকে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সেও আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়।'

যিশুর মতো একজন শিক্ষিত, সরল, নির্বিরোধ, মানবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, যিনি তাঁর সময়কালে ইজরায়েলের সামাজিক অনাচার, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক অশান্তি, অস্থিরতার বিপক্ষে নিজের শান্ত স্বভাব সুলভ রীতিতে শান্তির বাণী প্রচারে ব্রতী ছিলেন, তিনি কেমন করে এ কথা বলতে পারেন যে, 'শান্তি নয়, অশান্তি, গোলযোগ আর মানুষে মানুষে শত্রুতা সৃষ্টির জন্যেই আমার আবির্ভাব।' এটা কোনো প্রফেটের বাণী হতে পারে না। আসলে বাইবেলের উপরোক্ত কথাগুলোই প্রমাণ করে গসপেল রচয়িতাগণ বা খ্রিস্টধর্মের পাণ্ডারা যে কতো বড়ো মিথ্যেবাদী ছিলো। আর যিশু যদি সত্যি সত্যি এই কথাগুলো বলে থাকেন-তাহলে কোনো মানুষেরই উচিত নয় বাইবেল, ক্রুশ ও যিশুকে শ্রদ্ধা করা বা প্রফেট হিশেবে তাঁকে বিবেচনায় রাখা।

বাইবেলে যিশুর চরিত্রে মিথ্যাচারিতার আরেকটি প্রমাণ হলো শিষ্যদের উদ্দেশ্যে যিশু তাঁর একই ভাষণে আরো বলেছেন [৩],

> 'আর যে কেউ নিজের ক্রুশ বহন করে আমার পেছনে পেছনে না আসে (বা আমাকে অনুসরণ না করে) সে আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়।'

বাইবেলের সবচে' বড়ো ভুল কথা এবং যোচ্চুরি হচ্ছে এটি। সমগ্র বাইবেল অর্থাৎ নিউ টেস্টামেন্ট এবং যিশুর বিক্ষিপ্ত জীবনী থেকে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে রূপটি প্রতীয়মান হয় তাতে এ ধরণের মিথ্যে কথা তাঁর মুখ নিঃসৃত হওয়ার কোনো অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যিশুর কোনো বক্তব্য থেকেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তাঁর মিশন চলাকালীন সময় নিজের মৃত্যু বিষয়ে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া বা ক্রুশে তাঁর মরবার কথা কখনো কোথাও পরিষ্কারভাবে তো নয়ই, এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও তা ব্যক্ত করেছেন। এখানে এ ব্যাপারটি খুবই লক্ষণীয় যে, যিশু যখন শিষ্যদের ক্রুশ বহনের কথা বলছেন বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে তখন তিনি সদ্য ইজরায়েলে ফিরে নিজের নতুন অভিমত প্রচার করছেন কেবল। এবং বারোজন শিষ্য নির্বাচন করেছেন যারা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত ও সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। অথচ ওই শিষ্যদের মাঝে তিনি তাঁর মতামত প্রচারের প্রথম পর্যায়েই তাঁর পেছনে পেছনে ক্রুশ বহনের আদেশ দিচ্ছেন! মজার ব্যাপার হলো, তিনি কখনোই তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে ক্রুশের উল্লেখ কোথাও করেননি। এমনকি বাইবেলে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত যে উহ্য ভবিষ্যবাণীগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেখানেও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুর জীবনাবসানের কোনোই উল্লেখ নেই। আজকের আধুনিক খ্রিস্টপাণ্ডা-পুরুতগণ এ বিষয়টি সম্পর্কে কী জবাব দেবেন? নিশ্চয় তারা বলবেন-এটি তাদের 'ঈশ্বরপুত্রের' পরবর্তীকালের সংগঠিতব্য অলংঘনীয় ভবিষ্যবাণী। না, এ জবাব সঠিক নয়। এ ধরণের উত্তর পুরোটাই যাজক-পাদ্রিদের বুজরুকি, মিথ্যেকে সত্য বানাবার কারসাজি। যিশু তাঁর পেছনে পেছনে ক্রুশ বহনের যে আদেশ দিচ্ছেন বা হুমকি প্রদর্শন করছেন তা কেবল এ সত্যই প্রমাণ করে যে, এটি হচ্ছে ক্রুশিয় ঘটনার পর যিশুর অন্তর্ধানের পরবর্তী কালের চতুর খ্রিস্টপাণ্ডাদের একটি ইতর ফতোয়া বিশেষ, কোনোভাবেই যিশুর মুখ নিঃসৃত বাণী নয়।

এরকম অজস্র প্রমাণ নিউ টেস্টামেন্টের গোটা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আসলে সেসব খ্রিস্ট প্রচারক বা গসপেল রচয়িতাদের জানা ছিলো যিশুর ক্রুশিয় ঘটনা এবং তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, খ্রিস্ট সম্বন্ধীয় তাদের সত্যমিথ্যার জগাখিচুড়ি রচনা তাঁকালীন ইহুদি সমাজের শোষিত, নিপীড়িত, দীন-দরিদ্র মৃতপ্রায় মানুষের মধ্যে কোরামিনের কাজ দেবে। আর সেই সময় যিশু সম্পর্কে অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ সব গুজব, আজগুবি খবর, মিথ্যে প্রচার ও প্রপাগাণ্ডা, অলৌকিক গালগপ্পো ইজরায়েলের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। অস্বাভাবিকতা ও অলৌকিকতায় আকর্ষণ সাধারণ মানুষের প্রাচীনতম রোগ। আর এ রোগের রুগীর সংখ্যাই পৃথিবীতে অত্যাধিক। এদের পরিচালনা করেন একদল সুচতুর স্বার্থান্বেষী জ্ঞানপাপী। এ দলেরই অন্যতম খ্রিস্টপাণ্ডারা এই উপলব্ধি থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের প্রচারে যদি ক্রুশিয় ঘটনার আগেই যিশুর মুখে ক্রুশ টানার ফতোয়া সেট্ করে দেওয়া যায় তাহলে তা মানুষের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে এবং খ্রিস্টের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি সঞ্চলনে সমর্থ হবে। অর্থাৎ সহজ সরল বিশ্বাসী জনগণ মালটা খাবে ভালো। এবং অস্বাভাবিক, অলৌকিক প্রিয় জনগণ তা ভালোভাবেই খেয়েছে। তাই নিউ

টেস্টামেন্টের গসপেলে যিশুর মুখে সুপরিকল্পিতভাবে ক্রুশ বহনের এই মিথ্যে ভাষণ প্রচার করেছেন রচয়িতাগণ। মনে রাখতে হবে, প্রচারে কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

খ্রিস্টধর্মগ্রন্থ বলে প্রচলিত সমস্ত রচনাই যিশুর ক্রুশবিদ্ধ ঘটনার বহু বহু বছর পরে রচিত। যিশু নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এমনকি কোনোটির তত্ত্বাবধায়কও তিনি ছিলেন না। অবশ্য সে সুযোগও পাননি তিনি। তাঁর মিশন বা প্রচারকাল ছিলো খুবই অল্প, বড়ো জোর দু' থেকে আড়াই বছর মাত্র। যিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু এবং জীবনকালের গোটা অধ্যায় কেবল রহস্য-রহস্য আর রহস্যের মলাটে মোড়া। যিশু হচ্ছেন পৃথিবীর সবচে' রহস্যময় নায়ক বা মিস্ট্যারিয়াস হিরো। তাঁকে ধর্মীয় জগতের মেগাস্টারও বলা যেতে পারে। কারণ বিশ্বে কথিত যতো 'ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ' বা 'প্রফেট' ছিলেন তাঁদের মধ্যে যিশুর মতো রহস্যময়, জটিল, আকর্ষণীয়, কৌতূহলী পুরুষ দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তাঁর মতো বিতর্কিত প্রফেটও কেউ নন। সকল ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকেই একসময় মৃত্যুরস আস্বাদন করতে হয়েছে; যা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে অলংঘনীয় বিধান, কেবল যিশুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই বিধান বহির্ভূত ব্যবস্থা! একমাত্র যিশুই নাকি মৃত্যুহীন, মৃত্যুঞ্জয় বা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত কাল্পনিক হরোর ছবির মতো মানুষ! যা এখনো সাধারণ মানুষের কাছে এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল উঁকি দিতে পারে-

> 'তাহলে তিনি কোন্ ধাতুর মানুষ যে তাঁর মৃত্যু হতে পারে না এবং গত প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আজো তিনি আকাশ দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? তবে কী তিনি রক্ত মাংশের বদলে অন্য কোনো পদার্থে প্রস্তুত?'

বিজ্ঞানের কথা বাদ দিলেও ধর্ম বা ইতিহাস এ ধরণের প্রশ্নকে অবান্তর জ্ঞান করে। তারা পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়- যিশু রক্তমাংশেরই মানুষ ছিলেন, আর পাঁচজনের মতো তাঁকেও খাওয়া-দাওয়া, প্রাকৃতিক কর্মাদি সম্পাদন করতে হতো। তাহলে তাঁকে নিয়ে আজো কেনো এতো কিংবদন্তি? কেনো এতো আজগুবি সব কেচ্ছাকাহিনীর প্রচলন? কারণ ধর্মীয় জগতে তিনিই একমাত্র পুরুষ যাঁর জন্ম, মৃত্যু এবং মাঝখানের সমস্ত ঘটনাবলী সুচতুর এক রহস্যের রঙিন পর্দায় আবৃত, যেনো যাদুর এক রেশমি রুমাল। আর এ রুমাল বা পর্দা এতো চিত্র-বিচিত্র, মনভোলানো যে, এর চোখ জুড়ানো গোলক ধাঁধায় মানুষ দু'হাজার বছর ধরে চক্কর খাচ্ছে কুলুর বলদের মতো! এবং চক্কর খেতে খেতে ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে আসল যিশু হাওয়া হয়ে গিয়ে ঘটেছে নকল যিশুর আবির্ভাব। আর এই নকল ড্যামিটাকে নিয়েই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চলছে যতোসব উদ্ভট, আজগুবি যাত্রা-থিয়েটার! বাইবেলের ভাষ্যানুযায়ী ক্রুশিয় ঘটনার পর অর্থাৎ তথাকথিত পুনরুত্থানের পরে যিশু হচ্ছেন এক যাদুময় পুরুষ। যে কিনা হঠাৎ হঠাৎ যেখানে সেখানে হাজির হতে পারেন, আবার টুপ করে অদৃশ্য হয়ে যাবার শক্তিও রাখেন। তাঁর হাড় মাংশ আছে, তিনি স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করেন অথচ দরোজা জানালা বন্ধ ঘরে ভৌতিকভাবে সশরীরে ঢুকে যেতে পারেন! একেবারে গাঁজাখুরি ছবির নায়কের মতো মানুষ। যা কিনা সাধারণ মানুষের মনে সুপার পাওয়ারের বিশ্বাস সৃষ্টিতে এক ইন্দ্রজালিক প্রভাবে বশীকরণের প্রচেষ্টা। অথচ রক্তমাংশের মানব যিশুর কবর রচনার কথা ভাবাটা তাদের কাছে মহাপাপের বিষয়! মানব সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির সঙ্গে আজো অধিকাংশ মানুষের চিন্তা চেতনা যে ঘাস খাওয়া প্রাণীর মতোই নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে অবস্থান করছে তার বড়ো প্রমাণ এই হরোর টাইপের ভৌতিক যিশুর ধারণা এবং প্রতিচ্ছবি।

অন্যদিকে বেশির ভাগ মুসলমানও মনে করে-যিশু এখনো পর্যন্ত বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন! যদি প্রশ্ন করা হয়, 'সেটি কোথায়?' তাহলে উত্তর আসে, 'কোথায় আবার, আকাশে। আল্লাহ্র ডানপাশে বসে আছেন তিনি। হাদিসে আছে না।' এটি আরো বেশি অদ্ভুৎ শুধু নয় উদ্ভট বিশ্বাস। যা কেবল হাস্যকরই নয়, মানুষের চরমতম নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার উদাহরণ।

সকল ধর্মীয় পাণ্ডারা চিরদিন গোঁয়ারতুমি করে, আজগুবি মতবাদকে বহাল রাখার জন্যে রক্তপাত ঘটিয়েছে। রক্তপাত হচ্ছে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রথম অধ্যায়। পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো ধর্মই রক্তপাতহীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এ রক্তপাত ধর্মের সূচনা লগ্ন থেকেই মগজঘোলাদের বংশানুক্রমিক ব্যাধি। কিন্তু সুখের কথা হলো, এই সংক্রামক ব্যাধিতে সমস্ত লোককে আক্রান্ত করতে তারা সফলতা লাভ করেনি। এই মগজঘোলারা তাদের ধর্মের তথাকথিত বিধানের নামে ধারাবাহিক শোষণ-নির্যাতন, ধমক-ঠমক, চোখ রাঙিয়ে এবং রক্তপাত ঘটিয়ে; অর্থা হাজারো অপকর্মের আশ্রয় নিয়েও মানুষের মৌলিক মেধা উত্তরণের গতি রোধে ব্যর্থ হয়েছে। আজ কোনো মুক্তমনের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষে এ আজগুবি ধারণা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, তারই মতো রক্তমাংশের কোনো আদম সন্তান হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে, তাও আবার জমিনে নয়-আসমানে! অবশ্য বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে খাওয়া ধর্মবাদীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয় যারা যিশুর আকাশে বেঁচে থাকার থিওরি পূর্ণ বিশ্বাসভরে বুকে আগলে আছে। তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তর পাওয়া যায়, 'বিজ্ঞান ঠিকই আছে কিন্তু প্রফেট যিশুর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।' শিক্ষিত জ্ঞানপাপীদের এই আজগুবি ব্যতিক্রমের প্রশ্রয়ে, ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের সাশ্রয়ে এবং খ্রিষ্টিয় পাণ্ডাপুরুতদের আশ্রয়ে যিশুর যে ড্যামিটা পৃথিবীর মানুষকে বোকা-বেআক্কেল বানিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে আকাশ দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে এখন টেনে মাটিতে নামিয়ে আনার সময় হয়েছে। তাকে এখন আর হলিউড চলচিত্রের সুপারম্যানের মতো আকাশ দাবড়িয়ে বেড়াতে দেওয়া যায় না। তাহলে সেটা হবে বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিষ্কার প্রতারণা ও আজগুবি এক বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ, যা কোনো বিজ্ঞানমনস্ক সুস্থ সচেতন মানুষের কাজ নয়। বিতর্কিত যিনি এই রচনার নায়ক সেই যিশুই বাইবেলে স্বয়ং বলছেন, এমন ঢাকা কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা জানা যাবে না। অতএব তোমরা অন্ধকারে যা কিছু বলেছো, তা দিনের আলোতে শোনা যাবে, এবং অবরুদ্ধ ঘরে কানে কানে যা বলেছো, তা ছাদের উপর থেকে একদিন প্রচারিত হবে।[৪]

> আমি বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত করেছি, কেননা
> বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তির অভাব। যেসব বিশ্বাস উন্নতির
> আধুনিকতার প্রগতির সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার
> পক্ষে বাধা, সেগুলোকে আঘাত করেছি। শাস্ত্রীয়
> আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার...
>
> – আহমদ শরীফ

মুসলিম বিশ্বাস হচ্ছে, ইহুদিরা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেনি। তবে তাঁর মতো দেখতে অন্যজনকে ক্রুশে মারা হয়। এবং যিশুকে উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়; তিনি এখন স্বর্গ অর্থা বেহেস্তে অবস্থান করছেন, ভিন্ন মতে চতুর্থ আসমানে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, অন্য কাউকে নয়, যিশুকেই ক্রুশবিদ্ধ করা

হয়েছিলো এবং তিনি সে নির্যাতনে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয়নি। চতুর্থ শতাব্দির প্রথম দিকে লিখিত অজস্র গসপেলের মধ্যে একটি গসপেলে পরিষ্কার উল্লেখ ছিলো-ক্রুশে যিশু মৃত্যুবরণ করেননি। অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন তিনি অর্থা মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। তারপর একটি সমাধি-গুহায় তাঁর গোপন শিষ্যদের সেবা-শুশ্রুষায় সুস্থ হয়ে ছদ্মবেশে স্ত্রী মেরি মাগদালিনকে সঙ্গে নিয়ে প্যালেস্টাইন থেকে দামাস্কাসে পালিয়ে যান যিশু। সেটির নাম ছিলো 'নস্ট্রিক গসপেল।' সে গসপেলটি নব্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বী রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের আদেশে ৩১৩ কি ৩১৪ যিশুসালে নষ্ট করে ফেলা হয়। অন্য একটি সুসমাচার 'গসপেল অব ফিলিপস্' এর ৬৩:৩১ বচনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যিশু ও মেরি মাগদালিনের সম্পর্কের কথা।

যাহোক, মুসলমানদের এখনো তাঁর আকাশ বা বেহেস্তে বেঁচে থাকার বিশ্বাসটি যে তাদের ধর্মীয় রীতি-বিরুদ্ধ একটি বিশ্বাস এ কথা তারা মানতে চায় না। ইসলাম পরিষ্কার বলে, কেয়ামত বা মহাধ্বংসলীলা ঘটার পরই প্রথমে প্রতিটি মানুষের ভালো-মন্দের বিচার হবে ঈশ্বরের আদালতে। এবং তারপরই উত্তমরা বেহেস্তে ও আধমরা দোযখে যাবে। সেই বিচারে কারোরই রেহাই নেই। আর সেই ঘটনার আগে কোনো জীবিত মানুষ স্বর্গ বা নরকে যেতে পারে না। এবং আকাশে বেঁচে থাকার ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণ ভূয়া ও গাঁজাখুরি গপ্পো। আর যদি যিশুর মৃত্যু না-ই হয়ে থাকে (না হওয়ার প্রশ্ন তো ওঠেই না) তবে স্বশরীরে তাঁর স্বর্গে যাবার এবং এখনো সেখানে বেঁচে থাকার বিশ্বাস যে কতো বড়ো উদ্ভট ও আজগুবি বিশ্বাস এবং কোরানিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী তা মুসলমানরা বুঝতে চায় না। উল্টো তারা এই বিশ্বাসে মাতোয়ারা হয়ে আরো মনে করে, যিশু পৃথিবীর শেষলগ্নে আবার আবির্ভূত হবেন। তরোয়াল হাতে ক্রাইস্টবিরোধীদের হত্যা করবেন। সমস্ত শুকর মেরে ফেলবেন। সব ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। বিধর্মীদের ওপর থেকে পোল-টাক্স তুলে নেবেন। এবং তারপর বিয়ে করবেন। কিন্তু কাকে বা ক'জনকে করবেন তার উল্লেখ নেই। তবে তাঁর অনেকগুলো ছেলেপুলে হবে এবং পঁয়তাল্লিশ বছর, ভিন্ন মতে চল্লিশ বছর তিনি ন্যায়বান রাজা হিশেবে বীরদর্পে রাজত্ব করবেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর মদিনায় হযরত মুহম্মদের সমাধির কাছে আবু বকর ও ওমরের কবরের মাঝখানে তাঁকে সমাহিত করা হবে।[৫]

বুঝুন, কতোগুলো অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনো যিশুর বাকি! দুই হাজার বছর আগে লোকটা যখন স্বর্গে গেছেন তখন দু'চাকার একটি সাইকেলও পৃথিবীতে ছিলো না। ছিলো না আধখানা বন্দুক, এমনকি একখানা পটকাও। আর এখন প্রায় বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলার মতো যান, বস্তুকে ছাই করে দেবার মতো লেজারগান, গোটা কয়েক বিশ্বধ্বংস করে ফেলার মতো পারমাণবিক অস্ত্র মানুষের হাতে মজুত। এ অবস্থায় ঢাল-তরোয়াল হাতে একজন দু'হাজার বছরের বুড়ো কেমন করে ক্রাইস্টবিরোধীদের হত্যা করবেন, পৃথিবীর সকল শুকর মারবেন আর সমস্ত ক্রুশ ভাঙবেন? একথা ভাবতে গেলে বোকা বনে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। মানুষের পৌরণিক অবাস্তব কল্পকাহিনী যে বর্তমানেও বাস্তবতার রূপ নিয়ে মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকতে পারে, যিশুর প্রত্যাবর্তন ও পরবর্তী মিশনের এ অন্ধবিশ্বাস তার বড়ো প্রমাণ।

আচ্ছা, যিশু ক্রাইস্টবিরোধীদের চিহ্নিত করবেন কীভাবে? কারো চোখেমুখে তো সে কথা লেখা নেই, থাকে না। আর তিনি অন্তর্যামীও নন। তাহলে গোটা বিশ্বব্যাপী এ হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে কী করে

সম্ভব? এবং বন-জঙ্গল দাবড়িয়ে শুকরের সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠবেন কী বৃদ্ধ যিশু? তবে 'ছুঃমন্তর-ফুমন্তর/সকল শুকর মর' এ জাতীয় মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে যদি সমস্ত শুকর বধ করতে পারেন তাহলে অন্য কথা। রইলো ক্রুশ ধ্বংসের ব্যাপার। গির্জা-টির্জা, গোরস্থান-টোরস্থানের মেটালিক ক্রুশ না হয় ভাঙা গেলো। কিন্তু য়্যুরোপ আমেরিকায় ছেলেমেয়ে, নরনারীদের বুক-পাছা, হাতে-পায়ে যে কোটি কোটি ক্রুশ উল্কি করে আঁকা হয়েছে বা রয়েছে, সেসমস্তকে কোন্ পদ্ধতিতে ধ্বংস করবেন আমাদের থুড়থুড়ে যিশুদাদু? মাথায় খেলে না আমার। এখন কেউ যদি বলেন, 'আপনার তো মশায় বুদ্ধি-শুদ্ধি একদম নেই। যিশু কী সাধারণ লোক নাকি? তিনি হলেন প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর। তিনি কিনা করতে পারেন। তিনি একসময় অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, মৃতকে জীবিত করেছেন, আহারকে বাহারি করে খাইয়েছেন। আরো কতো কিছু করেছেন। জানেন না এসব?'

জানি ভাই, জানি। ওসব আদ্দিকালের রদ্দি কেচ্ছাকাহিনী ভুলে যান। ওগুলো এখন বাতিল মাল। আর যিশু কোনোকালে ওসমস্ত কিছুই করেননি। কালক্ষেপে সেসব তিল শুধু তাল হয়ে জন্মেছে। যিশু যদি মৃতকে জীবিত করে থাকেন তাহলে সেই কৃতিত্বে তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় নন। মড়াকে খাড়া করার কথিত গল্পের নায়ক পৃথিবীতে অনেকেই ছিলেন। শুধুমাত্র ওসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গেলে আলাদা একখানা বই লিখতে হবে আমাকে। হযরত মহম্মদের বেলায়ও এমন মৃতকে জীবিত করার গল্প আছে। শুনবেন? শুনুন-

> এক মহিলা হযরতের সঙ্গে হিজরত করতে মদিনায় গিয়েছিলেন। সেখানে তার একমাত্র পুত্র মারা যায়। ছেলেটির চাদর ঢাকা দেয়া লাশ হযরত মহম্মদের সামনেই ছিলো। মহিলা হযরতের পায়ের কাছে বসে কান্নাকাটি করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছিলেন, যেনো মৃত ছেলে জীবন ফিরে পায়। এর কিছুক্ষণ পর মৃত ছেলেটি সত্যি সত্যি হাত পা নাড়া দিয়ে মুখের চাদর সরিয়ে উঠে বসে। পরবর্তীকালে অনেক বছর নাকি সেই ছেলে জীবিত ছিলো।

এখন আমরা যুক্তিবাদীরা যদি জানতে চাই, হযরত মহম্মদ অন্যের একমাত্র মৃত পুত্রকে জীবিত করলেন অথচ তাঁর যদি সত্যি এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকতো তাহলে যখন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ্ মারা যান তখন তাঁকে কেনো তিনি পুনর্জীবন দান করলেন না? এর উত্তরে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মৌলবাদী কোনো মাওলানা-মুন্সির জবাব আমাদের প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা জানি এ গল্পটি ভুয়া। কোরআন বলে : মহম্মদের কোনো ক্ষমতা ছিলো না মৃতকে জীবিত করার। তিনি আর দশজনের মতোই রক্তমাংশের মানুষ ছিলেন (২১:৮/২৫:২০/৪১:৬)। তারপরও তাঁকে নিয়ে এরকম আজগুবি কাহিনী তৈরি হয়েছে। এরচে'ও আরো অদ্ভুৎ এক গল্প হযরত মহম্মদের সম্পর্কে আছে। তাহলো, উহুদের যুদ্ধে জনৈক আবদেল্লাহ্ নামে হযরতের এক অনুসারী মৃত্যুবরণ করেন। লোকটি তার পুত্র জাবিরের ওপর রেখে যান নিজের গোটা সংসারের দায়িত্ব ও ঋণের বোঝা। এ অবস্থায় মহম্মদ একদিন জাবিরের বাড়িতে দাওয়াত খেতে এলে জাবির তার একমাত্র উপার্জনের উৎস দুধেল মাদি ছাগলটা জবাই করে রান্না করেন। ব্যাপারটা জেনে হযরত সকল সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বসে বললেন, 'তোমরা মাংশ খাবে কিন্তু কেউ হাড় চিবুবে না।' তারপর আহার শেষে মহম্মদ সেই হাড়গুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তার উপর হাত রেখে দোয়া বা মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত ছাগল তৈরি হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।[৬]

এখন একে আপনি কী বলবেন? এরকম অসাধারণ ক্ষমতা যাঁর ছিলো তিনি তো চাইলে (যদ্দিন বেঁচে ছিলেন) তখনকার মৃত সমস্ত মানুষকেই বা তাঁর প্রিয়জনদের জীবিত করে তুলতে পারতেন। তাঁদের মৃত্যুতে তাঁর অশ্র"পাত করার কোনো কারণ ছিলো না। কোরান স্পষ্ট বলছে, মানুষ জানে না (মৃত্যুর পর) তাদের আবার কখন পুনরায় জীবিত করা হবে (২৭:৬৫)। আসলে এসমস্ত যে স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প তা বোঝার জন্যে মস্ত পণ্ডিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকে ক্লাশ ফাইভের বাচ্চারাও এসবের অসারত্ব বুঝতে পারে, পারবে। এবার যিনি আমাকে যিশুর অলৌকিকত্বের বাহাদুরি করে প্রশ্ন তুলতে চান; উত্তরে আমি তার কাছে জানতে চাইবো- বলুন তো উপরোক্ত দৃষ্টান্তের পর যিশুর চে' হযরত মহম্মদের অলৌকিক ক্ষমতা কম কোথায়? আসলে এসব গালগপ্পোগুলো চিরদিন আপনাদের মতো অন্ধবিশ্বাসীরা তৈরি করেছে। যারা কোনোদিন সত্যের খোঁজখবর-যাচাই বাছাই না করে বিশ্বাসের মাত্রাতিরিক্ত পুলকে লোকমুখে শোনা ঝাল খেয়ে তিলকে তাল করেছে চিরদিন। কোনো প্রফেট মানব না অতিমানব-এ প্রশ্ন ওঠেই না। কারণ অতিমানব বলে পৃথিবীতে কেউ নেই। ছিলো না কোনোদিন। গল্প-কাহিনী-বায়োস্কোপে তাদের পাওয়া যায়, বাস্তবে নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে একদল অতিউৎসাহী লোক এই অতিমানব কথাটি সৃষ্টি করেছে। এখনো করছে এবং করে। বেশিদূর যাওয়া লাগবে না, আপনার আশেপাশের মার্কামারা পীর-ফকির, সুফি সম্রাট, সুফি বাদশা ইত্যাদি স্বঘোষিত মালগুলোর দিকে তাকালে আপনিও হাটসেরা কোরবানীর তাগড়া গোরুর মতো আজকের তথাকথিত অতিমানবদের দেখতে পাবেন। তবে হ্যাঁ, এসমস্ত ভণ্ড, ধান্দাবাজ, নিকৃষ্ট লোকদের সঙ্গে যিশুর তুলনা চলে না। সত্যিকার অর্থে তিনি চমৎকার মানুষ ছিলেন। নির্বিরোধ, শিক্ষিত, নিরীহ, নির্লোভ সাধক পুরুষ। তাঁর প্রকৃত চরিত্রকে বিকৃত করে দিয়েছে খ্রিস্ট পাণ্ডারা। নিজেদের স্বার্থে। ক্ষমতার লিপ্সায়।

যিশুর স্বশরীরে স্বর্গে জীবিত থাকার থিওরি ইসলামি জগতে আরো যে একটি কারণে বিশ্বস্ততা লাভ করেছে তার পেছনে রয়েছে একটি হাদিস। যেটি হযরত মহম্মদের মি'রাজ বা উর্ধ্বলোকে গমন সম্পর্কিত। তিনি নাকি যখন দ্বিতীয়, ভিন্ন মতে চতুর্থ আকাশে পৌঁছান তখন সেখানে তিনি বেপ্টিস্টজন (যাঁকে গলা কেটে হত্যা করেছিলেন সম্রাট হেরোদ) ও যিশুকে দেখতে পেয়েছেন। কোরানিক দর্শনে কোনো জীবিত মানুষের সেখানে পৌঁছানোর বা বর্তমান থাকার কথা নয়। কেবল হাদিসের মাধ্যমেই ইসলামি দর্শনে এই গল্পটির অনুপ্রবেশ। আসলে প্রারম্ভিককালে যে সকল খ্রিস্টানরা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো তাদের কাছ থেকেই স্বশরীরে যিশুর স্বর্গলোকে গমনের থিওরি ইসলামি দর্শনে (হাদিসে) প্রবেশ করেছে। কোরানের ভাষ্য যদি সঠিক হয় তবে নিশ্চয় যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন বলেই সেখানে তাঁর তথাকথিত উপস্থিতি সম্ভব হলে হতেও পারে। হাদিসের বয়ান ভুল।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে যে কথাটি বলা প্রয়োজন, কোরানের ৪:১৫৮ আয়াতে যিশুকে ঈশ্বরের কাছে তুলে নেয়ার যে উল্লেখ আছে তা কোনোভাবেই স্বশরীরে তুলে নেয়া বোঝায় না। আর একে অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে বিবেচনা করা উচিত নয়। যারা এক্ষেত্রে সেটা করেন তারাই আবার অন্য বিষয়ে বলেন, কোরানের সব কথা আক্ষরিকভাবে নেয়া ঠিক না। অনেক রূপক-টুপক আছে ওসবে। তাহলে যিশুর বেলায় রূপক থাকবে না কেনো? এটা কী ধরণের গোঁয়ারতুমি? ঠিক এরকম আরো প্রায় অর্ধশত আয়াত কোরানে আছে যা মানুষের মরণোত্তর তুলে নেয়া বা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া অর্থে ব্যক্ত। এবং একই অর্থে কোরানে অন্যত্র যিশুর

জবানিতে বলা হয়েছে-'তারপর আপনি (ঈশ্বর) যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে জানতেন' (৫:১১৭)।

এই তুলে নেয়াকে যদি কেউ যিশুকে সশরীরে তুলে নেয়া বোঝেন তাহলে তা হবে কোরানিক দর্শনের পরিপন্থী। কারণ কোরানের ঈশ্বর স্পষ্ট ঘোষণা করছেন: প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (৩:১৮৫)। এবং তারপরই তাঁর কাছে তুলে নেয়া বা ফিরে যাওয়া বোঝায়। একথাও কোরানে লেখা আছে হযরত মহম্মদকে উদ্দেশ্য করে যে, 'তুমি বলে দাও : তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত মৃত্যুদূত তোমাদের প্রাণ সংহার করবে, তারপর তোমাদেরকে তোমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে' (৩২:১১)। যিশু অতিমানব বা কোনো সুপারম্যান ছিলেন না। ধর্মীয় অনুশাসনে তিনি একজন কথিত প্রেরিত পুরুষ মাত্র। রক্তমাংশের স্বাভাবিক মানুষ। অন্যান্য কথিত প্রেরিতরা যেমন ছিলেন। জীবন থাকলে যেমন মরণ নিশ্চিত তেমনি যিশুও যথাসময়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনায় আমরা পরে আসবো।

কোরানের সুরা ৩, আয়াত ১৪৪ এ বলা হয়েছে, 'মহম্মদ একজন প্রেরিত পুরুষ ভিন্ন কিছু ছিলেন না এবং অবশ্যই তাঁর পূর্বের সমস্ত প্রেরিত পুরুষরা মৃত্যুবরণ করেছেন।' এরপরও যিশুকে অদ্যাবধি জীবিত মনে করাটা বোকামি তো বটেই সঙ্গে কোরানের বাণীকে অবিশ্বাস করার মতো অপরাধ নয় কী?

জীবিত স্বর্গে তুলে নেয়া বা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া যিশু সম্পর্কিত ধারণাটি যে সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা ধর্মীয় দর্শন তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হাজার বছরের আকাশ দাবড়ানো রহস্যময় যিশু আজ মানুষের সুস্থ জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার কাছে রহস্যহীনভাবে বন্দি। এতে তাঁর সম্মান কিছু খর্ব হয় না বরং বাস্তবতার মাটিতে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সত্যিকারের কালজয়ী নায়ক হিশেবে চিহ্নিত হন। যার তুলনা পৃথিবীতে কেবল তিনিই স্বয়ং। আমাদের দেশে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে; পরিবারের কোনো সন্তানের যদি অকালমৃত্যু হয় তখন তার স্বজনরা আফসোস করে বলে, 'আল্লাহ্র মাল আল্লাহ তুলে নিয়েছেন।' বাস্তবে কিন্তু সেই 'মালটিকে' মৃত্তিকাতেই কবরস্থ করা হয়। তাহলে আল্লাহ্ কী করে তুলে নিলেন? এই তুলে নেয়াটাকেই কোরানে বারবার বলা হয়েছে ফিরে যাওয়া, ফিরিয়ে নেওয়া বা প্রত্যাবর্তন।

* তাঁরই (আল্লাহর) কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ১০:৪
* হযরত মহম্মদ বলছেন, 'তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।' ১৩:৩০/৩৬
* আল্লাহ্র দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। ২৪:৪২
* আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। ২৯:৮
* তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। ৩০:১১
* অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। ৩১:১৪
* অবশেষে তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ৩৯:৭
* আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবো। ৪৩:১৪

এ সমস্ত কথার মানে কী স্বশরীরে ফিরে যাওয়া বা তুলে নেওয়া? ইসলামি দর্শনে এটা মৃত্যু পরবর্তী আত্মাটাত্মার ব্যাপার। যা নাকি অদৃশ্য, অবয়বহীন। এই মানদণ্ডে কেবল যিশু সম্পর্কিত আয়াতের ভিন্ন মানে করা কী কোরানের স্ববিরোধী বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না? আর কোরানের কোথায় লেখা আছে যিশু পুনরায়

পৃথিবীতে ফিরে আসবেন? শুকর ও ক্রাইস্টবিরোধীদের হত্যা করবেন, খেয়ে না খেয়ে সমস্ত ক্রুশ ভাঙবেন; কোথায় লেখা আছে এসব কোরানে? এসমস্ত বাজে কথা এলো কোথা থেকে? উত্তর : এসেছে হাদিস থেকে। হাদিসের তরিতরকারিতে হলুদ-মরিচ-গরমমশলা মিশিয়ে ধান্দাবাজ আলখেল্লাধারীরা যা খুশি পরিবেশন করলে আজো তা নির্দ্বিধায় গিলতে হবে নাকি? তাদের এ সমস্ত আজেবাজে খাদ্য তারা মানুষকে হজম করাতে গিয়ে এখন নিজেরাই হয়ে উঠেছে কোরানের বড়ো শত্র" । তারা যাচ্ছেতাইভাবে ডরভয় দেখিয়ে শিশুকাল থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর মুক্তচিন্তা ও মৌলিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এর কেবল একটা সামান্য দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যাক।

অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বাস করে তার মৃত্যুপরবর্তী কবরস্থ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে সে আবার কবরে জীবিত হয়ে উঠবে ফেরেশতা বা যুগল দেবদূতের আগমনে। এবং শুরু হবে তার উপর সওয়ালজবাব ও শাস্তি বা নিপীড়ন। কিন্তু কোরানের কোথাও এই জীবিত হয়ে ওঠা বা কবর আজাবের কথা লেখা নেই। বরং কবরে মৃতের জীবিত হয়ে ওঠার কথা কোরানিক ভাষ্যে সম্পূর্ণ বাতিল। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে: 'মৃতেরা জীবিত নয়, প্রাণহীন, নির্জীব, তারা জানে না যে কখন আবার জেগে উঠবে' (১৬:২১)। 'মানুষ জানে না তাদের আবার কখন পুনরায় জীবিত করা হবে' (২৭:৬৫)। অন্যত্র কখন মৃতকে জীবিত করা হবে তার নির্দিষ্ট সময় বা কাল বলে দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 'এরপরে অবশ্যই তোমরা মরবে, তারপর কেয়ামতের দিন পুনরায় তোমাদের জীবিত করে উঠানো হবে' (২৩:১৫-১৬)। অথচ কাঠমোল্লারা হাদিসের দোহাই পেড়ে এর উল্টো কথাবার্তা বলে বেড়ায়। তাদের কাছে কোরানের চে' হাদিস বড়ো বিষয়, কোরান হলো তোতাপাখির মতো সুর করে আবৃত্তি করার পুস্তক!

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা নিশ্চয় অপ্রসঙ্গিক হবে না যে, অধিকাংশ মুসলমান কেবল নয়, মক্তব-মাদ্রাসার শতকরা ৯৫ জন মুন্সি-মাওলানা ধর্মশিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন-কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। এ সংখ্যাটি ছেলেবেলায় মায়ের বেত্রঘাতের ভয়ে সকালে পাড়ার মসজিদে ওস্তাদজির কাছে ধর্মশিক্ষা লাভ করতে গিয়ে আমিও শিখেছিলাম। তোতাপাখির বুলি শেখাবার মতো ওস্তাদজি আমাদের তাই শিখিয়েছিলেন, 'আশমানি কিতাব পবিত্র কোরানের আয়াত সংখ্যা হইল ৬৬৬৬টা, বুঝলি। মনে রাখ্বি সবসময়।' বহু বছর আমিও তাই মনে রেখেছি। কিন্তু পরিণত বয়েসে পৌঁছে দেখলাম ছেলেবেলায় ওস্তাদজির শেখানো শিক্ষা ভুয়া। ভুল। কোরানের প্রকৃত আয়াত সংখ্যা হচ্ছে, ৬২৩৬ টি। অথচ এখনো মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষকরা শুধু নন, ইসলামি পণ্ডিত হিশেবে পরিচিত কোরান অনুবাদকদের অনূদিত কোরানে উল্লিখিত আছে আয়াত সংখ্যা-৬৬৬৬!

দৃষ্টান্ত-১.

বেঙ্গলি ট্র্যান্সেশন অব দ্য হোলি কোরান বাই প্রিন্সিপাল আলী হায়দায় চৌধুরী। হাদিয়া : দশ টাকা মাত্র। ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের সৌজন্যে প্রকাশিত। ডিসেম্বর ১৯৬৮। প্রকাশক : রুহুল আমিন নিজামী, ৩/১০ লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা-১। ঝিনুক পুস্তিকার এই অনুবাদে কোরানে ১১৩ বিসমিল্লাহ্ সহ আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৬৩৬৭ টি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, একটি মুসলিম সম্প্রদায় 'বিসমিল্লাহ্' কে আয়াত হিশেবে বিবেচনা করে। তাহলে সেই হিশেবে ৬৩৬৭ থেকে ১১৩ বাদ দিলে দাঁড়ায় ৬২৫৪ আয়াত। এটিও

ভুল। কোরানের সর্বমোট ১১৪ সুরার মধ্যে একমাত্র সুরা 'তওবায়' বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা হয় না। বাকি প্রতিটি সুরার পূর্বে 'বিস্মিল্লাহ্' একবার করে পাঠ করা হলেও অন্য একটি সুরায় 'বিস্মিল্লাহ্' দুইবার পাঠ করা হয়। সুরাটির নাম - 'নামল', সুরাটির শুরুতে এবং ৩০ নং আয়াতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১১৪ সুরার মধ্যে 'তওবা'য় বিসমিল্লাহ্ উচ্চারিত না হলেও ১১৪ বারই কোরান পাঠের সময় বিস্মিল্লাহ্ উচ্চারিত হয়।

উল্লেখিত মুসলিম সম্প্রদায়টি ছাড়া শিয়া, সুন্নিসহ অন্য কোনো মুসলিম সম্প্রদায় 'বিসমিল্লাহ্'কে কোরানের আয়াত হিশেবে বিবেচনা করে না। তাই দেখা যাচ্ছে প্রিন্সিপাল চৌধুরীর অনূদিত কোরানে বিসমিল্লাহ্কে আয়াত হিশেবে বাদ দিলে ৬২৫৪ সংখ্যাটিও ভুল।

অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনূদিত কোরানের মধ্যে আরো একটি মজার ব্যাপার হলো, তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে বিভিন্ন মনীষীর নামের তালিকায় প্রথমই উল্লেখ করেছেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের নাম, কিন্তু তিনি তাঁকে সম্বোধন করেছেন, 'গিরিশ বাবু' বলে। এবং ভাই গিরিশ, যিনি কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদক, হায়দার সাহেব বলেছেন-তিনি তাঁর অনুবাদে ভাই গিরিশের ভাষান্তরেরও সাহায্য নিয়েছেন। অথচ সুরা ৫ এর ১১৭ নং আয়াতে যিশু সম্পর্কে ভাই গিরিশ যে 'শব্দটি' ব্যবহার করেছেন, অধ্যক্ষ সাহেব সেটিকে পাশ কাটিয়ে বা বাদ দিয়ে লিখেছেন- 'তৎপর তুমি যখন আমাকে লইয়া গেলে...'(পৃষ্ঠ-১৪৯)। কোথায় লইয়া গেলো?
সম্মানিত পাঠক, আমি সেটাও জানাবো, একটু ধৈর্য ধরুন।

দৃষ্টান্ত-২.

খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মার্চ ২০০০ সংস্করণ-আরবীয় বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুযূলসহ 'কোরআন শরীফ' এর মূল আরবীয় বঙ্গানুবাদ করেছেন ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, পিএইচডি (লণ্ডন), এম.এ. (ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট), বি.এ.(অনার্স), ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট, মুমতাযুল ফুকাহা (ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট), অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতি ক্ষেত্রে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট এমন ইসলামি তারকা পণ্ডিত লোকটিও তাঁর ভাষান্তরিত কোরানে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ৬৬৬৬। কিন্তু তিনি যখন 'মতান্তর' শব্দটি ব্যবহার করে আয়াতের সংখ্যা ৬২৩৬ লেখন তখন আমাদের মস্তিষ্কে চুলকানো সংশয়ের উদ্রেক হয়-তিনি কতোটা সাচ্চা! এরকম আরো ডজন ডজন দৃষ্টান্ত আমাদের গোডাউনে মজুদ আছে।

যাহোক, কোরান আর হাদিস; এই দু'এ মিলেই ইসলামি দর্শন। হাদিস হলো নকল-নকল-হদ্দ নকলের এক সম্ভার। যে গ্রন্থটির জন্যে মুসলিম সম্প্রদায় মরিস বুকাইলিকে নিয়ে গর্ব করে; তাঁর সেই 'দ্য বাইবেল দ্য কোরান এ্যাণ্ড সাইন্স' গ্রন্থে মরিস হাদিসকে ভেজাল, দূষণীয়, যা ঘটে নাই তার উপস্থিতি সমৃদ্ধ বিষয় বলে ঘোষণা করেছেন। সোজা কথায় প্রায় বাতিলের পর্যায়ভুক্ত করেছেন তিনি হাদিসকে। শোনা যাক তাঁর বক্তব্য।

মরিস তাঁর গ্রন্থের শুরুতে ইন্ট্র্যাডাকশনে বলছেন, 'বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের গসপেলগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন ধর্মগ্রন্থ মুসলমানদেরও আছে। তাহলো তাদের হাদিসগ্রন্থ। হাদিস হলো মহম্মদের

কথা ও কাজকর্মের বিবরণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ। যিশুর কথা ও কাজের বিবরণ হিশেবে যেমন নিউ টেস্টামেন্ট, হাদিস সেরকমই ধর্মগ্রন্থ। যিশুর অন্তর্ধানের কয়েক দশক পরে যেমন নিউ টেস্টামেন্টের গসপেলগুলো রচিত হয়েছিলো তেমনি হাদিসও রচিত হয়েছে মহম্মদের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে। হাদিস ও গসপেল উভয়ের মধ্যে রয়েছে অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার লোকমুখের বিবরণ। আজ অনুসন্ধানে একথা প্রমাণিত যে, সঠিক গসপেল হিশেবে বিবেচিত সেসবের লেখকরা কেউ লিখিত ঘটনা বা বিবরণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। এ গ্রন্থের শেষান্তে আলোচিত হাদিসের ব্যাপারেও এই সত্য প্রযোজ্য।'

চলুন এবার মরিস বুকাইলি তাঁর গ্রন্থের শেষান্তে হাদিস সম্পর্কে কী বলেছেন তা আমরা সংক্ষেপে পাঠ করি[৭] –

> 'হাদিস শব্দের অর্থ হলো বক্তব্য বা উচ্চারণ। তবে প্রচলিত অর্থে মহম্মদের কর্মজীবনের বিবরণকেই হাদিস নামে আখ্যায়িত করা হয়।... সম্প্রতি মদিনার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. মহম্মদ মোহসিন খান সম্পাদিত আরবি/ইংরেজির একটি দ্বিভাষি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (যার প্রথম সংস্করণ হয় পাকিস্তানের গুজরানভালা থেকে ১৯৭১ যিশুসালে)। সত্যতা ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে বুখারির হাদিসের স্থান কোরানের পরেই। ইসলামিক ট্র্যাডিশন নামের একটি সংস্থা থেকে (১৯০৩-১৯১৪) হুদাস ও মারকাইসের একটি বুখারি হাদিসের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যারা আরবি ভাষা জানেন না তারা এ অনুদিত হাদিস পড়ে দেখতে পারেন। তবে হাদিসের বিভিন্ন ভাষান্তরের ব্যাপারে পাঠককে সচেতন থাকতে হবে। কারণ ফরাসিসহ য়্যুরোপের অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হাদিসে অসঙ্গত বক্তব্য ভরে দেয়া হয়েছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এগুলো আসলে অনুবাদ নয়, ব্যাখ্যা। এছাড়া কোনো কোনো অনুবাদে হাদিসের আসল বক্তব্যের রদবদল তো করা হয়েছেই, সে সঙ্গে হাদিসে যা নেই তাও জুড়ে দেয়া হয়েছে হাদিসের নামে।
>
> 'মূল বা উৎসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মুসলমানদের হাদিস আর খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্টের ফোর গসপেলস্ প্রায় একই ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ। নিউ টেস্টামেন্ট ও হাদিস রচয়িতাদের কেউই বর্ণিত ঘটনা বা বিবরণের প্রত্যক্ষদর্শী নন। কেবল তাই নয়, উভয় ক্ষেত্রে এসব রচনায় বর্ণিত ঘটনা ও বক্তব্যগুলো বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার বহু পরে সেগুলো সংকলিত হয়েছে। বাইবেলের গসপেলগুলোর মতো হাদিসগ্রন্থের ব্যাপারেও একথা সত্যি যে, এসবে বর্ণিত বা লিপিবদ্ধ সবকিছুই বিশ্বাসযোগ্য, প্রামাণ্য বা একদম সঠিক একথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত নয়। হাদিসের ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁদের কাছে খুব অল্প সংখ্যক হাদিসই সঠিক হাদিস হিশেবে অনুমোদন লাভ করতে পেরেছে। এ কারণে আল-মুয়াত্তা, সহি মুসলিম এবং সহি আল-বুখারি ছাড়া বাকি হাদিসগ্রন্থে দেখা যায় সঠিক বলে পরিচিত হাদিসের নামে এমন সব হাদিস রয়েছে যেগুলো হয় জাল, নয়তো বাতিল।
>
> 'সহি মুসলিমকে যদিও সঠিক হাদিসগ্রন্থ বলে মনে করা হয়, তথাপি আমি আমার এই গবেষণায় সবচে' প্রামাণ্য ও সঠিক বলে বিবেচিত আল-বুখারিকেই বেছে নিয়েছি। এ কাজ করতে গিয়ে একটা কথা আমি সব সময় মনে রেখেছি যে, অনেক লোকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এসমস্ত হাদিসগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে মানুষেরই হাতে। প্রথম এ সমস্ত চালু ছিলো লোকমুখে। এসবের কোনো কোনো বর্ণনা কমবেশি সঠিক। আর যেগুলো সঠিক নয় সেগুলোর জন্যে দায়ী তারাই-যাদের মাধ্যমে এসকল হাদিস চালু ছিলো। এছাড়া এমন সব হাদিসও রয়েছে, যেসব হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক। এবং সেসব হাদিসের সত্যতা ও সঠিকতা সন্দেহজনক।

'আমি আমার এ রচনায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিভিন্ন হাদিসের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি। এর আগে কোরানের বিভিন্ন আয়াত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব-তথ্য যেভাবে ব্যবহার করেছি, এ ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ফল, তা মুখে না বলে দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কোরানে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে সেখানে হাদিসে বর্ণিত একই বিষয়ের তথ্যাবলী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সত্য বা প্রামাণ্য হিশেবে দাঁড়াতেই পারছে না।...

'এমনও দেখা গেছে, কোনো কোনো বাণীর ব্যাখ্যা হিশেবে হাদিসের কোনো কোনো বাণীকে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং হাদিসের সেই ব্যাখ্যা টেনে ব্যাখ্যাকারী বা ইসলামি পণ্ডিতরা কোরানের বিভিন্ন বক্তব্যের যেসব আলোচনা বা ভাষ্য রচনা করেছেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সেসব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। ... এসব আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তই নেয়া চলে যে, হাদিসগ্রন্থগুলোতে এমন হাদিসও আছে যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা যায় না। আর এসব হাদিস আসলেই সঠিক কিনা এ সন্দেহ থেকেই যায়।

'এই যে, দু'ধরনের (ইসলামি) ধর্মগ্রন্থ-কোরান ও হাদিস, এদের উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, সে পার্থক্য বা অমিলের ওপরই সবচে' বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। কোরান এবং হাদিসের মধ্যে এই যে অস্বাভাবিক ব্যবধান এটা কেবল ভাষা বা সাহিত্য-মানের দিক থেকে নয়; এ ব্যবধান বিষয়-বস্তুর দিক থেকেও উল্লেখ করার মতো। আসলে কোরানের ভাষা ও বচনভঙ্গির সঙ্গে হাদিসের ভাষা-বচনভঙ্গির তুলনা তো দূরের কথা, তুলনার কথা চিন্তাই করা যায় না। সবচে' বড়ো কথা, এ দু'ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থের রচনাগুলো যখন যুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তখন উভয়ের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে; তা লক্ষ করে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারবেন না। ...

'সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র অল্প কিছু হাদিসেই মহম্মদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সঠিক প্রতিফলন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বাদবাকি হাদিসে যেসব চিন্তা-ভাবনা ও বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই সেই যুগে প্রচলিত (লোক কাহিনী) বা সাধারণ মানুষের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না।'

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা ছবি ছিলো ঘোড়ার শরীর, নারীর মাথা আর পিঠে তথাকথিত পরীর পাখা লাগানো এক অদ্ভুৎ প্রাণীর। সেটি ছিলো কাপড়ে রঙিন সূতোয় বোনা হস্তশিল্প। আমার মায়ের হাতের সুচিকর্ম। সেই ছবিটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে লাগিয়েছিলেন বাবা। পরে জানতে পারি ছবির প্রাণীটির নাম- বোরাক। এরই পিঠে চড়ে নাকি হযরত মহম্মদ মি'রাজ গিয়েছিলেন। এবং চোখের পলকে সংঘটিত হয়েছিলো সেই যাত্রা। কিন্তু প্রাণীটিকে বাস্তবে পৃথিবীর কেউ কখনো দেখেছে বলে কোনো প্রমাণ বা উল্লেখ কোথাও নেই। তারপরও ওই প্রাণীর অদ্ভুৎ অবয়বের চিত্র মানুষের হাতে কী করে এলো এ প্রশ্নের জবাব সেদিন খুঁজে পায়নি আমার কিশোর-মগজ। তবে মানুষের ধর্মীয় কল্পনা যে কি সৃষ্টিছাড়া হতে পারে তথাকথিত বোরাকের ছবি আমাকে তা বুঝতে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে! সেই ছেলেবেলা থেকেই । এখানে বোরাকের কথা বলছি শুধু এই কারণে; যেহেতু তারই সাহায্যে মহম্মদ উর্ধ্বলোকে গিয়ে অন্যান্য প্রফেটদের সঙ্গে (যাঁরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ এখনো জীবিত বলে মনে করা) যিশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে হাদিস ও তফসির আমাদের কৌতূহল উদ্দীপক গল্প শোনায়। অথচ আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি-কোরান একেবারেই স্বীকার করে না কোনো জীবিত মানুষের স্বর্গলোকে যাবার কথা। তাহলে ওখানে মৃত প্রফেটদের সঙ্গে জীবিত যিশুর উপস্থিতি কী কোরানের ভাষ্যকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে না? আর মহম্মদের

মি'রাজ গমনের কথা কোরানের যে তিন জায়গায়[৮] উহ্যভাবে উল্লেখ আছে সেখানে তো কেবল একজন দেবদূত ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মহম্মদের দেখা হওয়ার কথার উল্লেখ নেই। তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় প্রথম কোরানের বাণী বিশ্বাস করবে না হাদিসের গল্প, এ প্রশ্ন কী ওঠে না? আর হাদিস যে কী জিনিশ তাতো আমরা মরিস বুকাইলির মুখে শুনলামই। আর ওই পাখা দাবড়ানো বোরাকের মতো কোনো প্রাণীর পিঠে চড়ে চোখের পলকে সপ্তাকাশ ভ্রমণ আজ বৈজ্ঞানিক বিচারে বাতিল বলে প্রমাণিত। এবং আজকাল আর ওই তথাকথিত বোরাকের ছবি কারো ঘরে দেখাও যায় না। মানুষ যেমন আজ বুঝতে পেরেছে ওই ঘোড়া-নারী-পরীমার্কা কিম্ভুত প্রাণীটি আসলে মানুষেরই কল্পনার ফসল তেমনি আগামীতে তারা ক্রমশ আজো প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের বহু ফাঁকি বুঝতে পারবে; এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত বলছি, আরবিয় ভূখণ্ডে উদ্ভুত দু'টি ধর্মশাস্ত্রেই আছে-পৃথিবী স্থির। তার নড়নচড়ন নেই। এককালে মানুষ বিশ্বাসও করতো এ কথা। সে সময় যাঁরাই এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তাঁরাই পড়েছেন ধর্মীয় কোপানলে। কিন্তু একথা কী আজ আর কেউ বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী স্থির? করে না। কারণ আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত-পৃথিবী স্থির নয়, ঘূর্ণায়মান। সেকেণ্ডে ১৬ মাইল বেগে আমাদের এই গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। আর সূর্য অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে নিয়ে ছুটে চলেছে আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যতার মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে ৪২ মাইল গতিতে। তর্কের খাতিরে বললে বলা যায়, তবু মি'রাজ গমনে মহম্মদের একটি অবলম্বন ছিলো, কিন্তু বিনা অবলম্বনে যিশু সশরীরে স্বর্গলোকে গেলেন কোন্ অদৃশ্য পাখায় ভর করে?

এমন অনেক কল্পনাপ্রসূত ধর্মীয় বিশ্বাস বা তথাকথিত সত্য অসত্যে প্রতিপন্ন হয়েছে। হচ্ছে এবং হবেও। মুশকিল হলো, বিজ্ঞানে যেমন যাচাই-বাছাই, পরিবর্তন-পরিবর্ধন আছে; ধর্মে তা অনুপস্থিত। সে হলো ঠ্যাঁটা-মুরুব্বি। একেবারে অকাট্য, অভ্রান্ত, অপরিবর্তীত সত্যের পরাকাষ্ঠা। যা কিনা মানুষের মৌলিক বিকাশ, প্রকাশ, মুক্তচিন্তা ও মননশীলতার প্রধান অন্তরায়। আমরা মুক্তচিন্তার মানুষরা যখন শাস্ত্রীয় কোনো অসামঞ্জসের প্রশ্ন তুলি তখুনি আমাদের মুরতাদ, কাফের, নাস্তিক ইত্যাদি বলে শোর তোলা হয়। অথচ ধর্মপরায়ণ, আস্তিক বলে পরিচিত অসৎ লোকগুলো যখন কোরানের নামে মানুষকে মিথ্যে কথা বলে, তখন কেউ তাদের কিচ্ছুটি বলে না। তাদের বিরুদ্ধে কোনো শোর তোলে না। আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি কোরানের কোথাও যিশুকে সশরীরে উর্ধ্বলোকে তুলে নেয়ার কোনো উল্লেখ নেই। অথচ এদেশে ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত খাজা মোজাম্মেল হক এনায়েতপুরী তাঁর 'অনির্বাণ শিখা' নামক রচনায় যিশু সম্পর্কে লিখেছেন [৯],

> 'কোরানের বাণী অনুযায়ী তিনি কাতলিত (Creucified) হননি' (এতোটুকুই মাত্র সঠিক, কিন্তু তারপর তিনি বলছেন) 'বরং সশরীরে উর্ধ্বলোকে গমন করেছেন এবং বেহেশ্তে অবস্থান করছেন এবং শেষ জামানায় তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।'

এটি একটি ডাহা মিথ্যাচার তাও আবার কোরানের নাম ভাঙিয়ে, যে কোরান মুসলিমদের কাছে প্রশ্নাতীত পবিত্র ও বিশ্বস্ত গ্রন্থ। এনায়েতপুরী তাঁর এই মন্তব্যের কোরানিক প্রমাণ হাজির করুন, কোনো হাদিস-টাদিস আঁটা তপ্পিমারা আলখেল্লা হাজির করলে চলবে না, সুস্পষ্ট কোরানের বাণী চাই। চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তাঁকে। নয়তো তাঁকে 'মস্ত কাফের' এবং 'কোরান বিকৃতকারী' হিশেবে চিহ্নিত করা হোক, সঙ্গে সঙ্গে এই দাবিও রাখছি।

আজকাল আবার কিছু অর্ধশিক্ষিত চালিয়াত বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে কোরানের ভাষ্য বিকৃত করে নিজেকে মুসলিম পণ্ডিত জাহির করতে চায়। এমনি এক আদমের নাম মুহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী। জনৈক এ লোকটা ১৫.১০.০১ দৈনিক যুগান্তরের 'ইসলাম ও জীবন' এর পাতায় দাম্ভিক উচ্চারণ 'বিজ্ঞানকে পথ দেখিয়েছে মিরাজ' নামক রচনায় সৃষ্টিছাড়া সব কথাবার্তা বলে মানুষকে বোকা বানাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মহম্মদ নাকি রক্তমাংশের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নূর অর্থাৎ আলোর তৈরি! তাই সিরাজী তাঁকে আলোর গতির সঙ্গে তুলনা করে তথাকথিত বোরাককে নভোযান বলে তার মধ্য দিয়ে হযরতকে সপ্তাকাশে পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই লেখা যায় এবং তাঁর বক্তব্যকে তুলোধুনো করে বাতাসেও ওড়ানো যায়। কিন্তু সেটা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি না। তিনি কেবল বলুন, বোরাক নামক ওই নভোযানটি কোন্ দেশের কোন্ বৈজ্ঞানিক কারখানায় তৈরি হয়েছিলো? উত্তরে ঈশ্বর-টিশ্বরের দোহাই পাড়লে চলবে না। কারণ বিজ্ঞানের মদদ যখন তিনি নিয়েছেন তখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই তাঁকে দিতে হবে। একেবারে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা। তিনি যে এ বিষয়ে কতোটা মহাপণ্ডিত তা তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, 'মুহাম্মদের (সাঃ) নূরের অংশ থেকে সৃষ্ট আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। মহানবীর (সাঃ) নভোচারণ ছিল বোরাকের সাহায্যে, যার গতির সঙ্গে সবকিছু অতুলনীয়। অতএব, বোরাকের গতি ও মুহাম্মদের (সাঃ) নিজস্ব গতির সমন্বিত ফল Resulten motion আরও অনেক গুণ বেশি হবে।'

ওরে সব্বোনাশ! তাঁর এই অলীক পাগলামোর কোরানিক প্রমাণ দেয়ার আগে আরেকটুখানি দেখা যাক লোকটা আরো কী ধরনের প্রলাপ বকেছেন। অন্য এক জায়গায় তিনি বলছেন, 'বিরুদ্ধবাদীদের অন্যতম যুক্তি হচ্ছে, জড়দেহ লইয়া নভোলোকে পৌঁছা অসম্ভব। কিন্তু কথা হচ্ছে, মুহাম্মদ (সাঃ) মানব ছিলেন বলে যে তার দেহ আমাদের মতো জড় উপাদান বিশিষ্ট ছিল তা তো নাও হতে পারে। বুনিয়াদ এক হলেও প্রত্যেক বস্তুর প্রকাভেদ তো আছে। কয়লা থেকে হীরক প্রস্তুত হয় এবং উভয়ই পদার্থ, কিন্তু তাই বলে কয়লা ও হীরক কি একই বস্তু? ।

'তাছাড়া সব পদার্থের ধর্ম যে সর্বত্র একই রূপ থাকে তা নয়। কাচ একটি জড় পদার্থ। বাধা দেয়া জড় পদার্থের ধর্ম। আমাদের দেহ তা ভেদ করতে পারে না, কিন্তু কোন আলোকরশ্মিকে সে বাধা দিতে পারে না। সসম্মানে তার জন্য নিজের দেহের ভেতর দিয়ে পথ ছেড়ে দেয়। আবার অনেক অস্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে সাধারণ আলো প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যদি তাদের ওপর X-Ray করা হয়, তবে সে তা ভেদ করে চলে যায়।

'অতএব বলা যায়, মুহাম্মদ (সাঃ) জড়ধর্মী ছিলেন না। পদার্থের যা সার নেই জ্যোতি বা নূর থেকে মুহাম্মদের (সাঃ) সৃষ্টি। ফলে স্থূল দেহ নিয়েও তার পক্ষে আকাশ ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিলো।'

তিনি একবার বলেন নূর, একবার বলেন স্থূল দেহ! আচ্ছা, তর্কের খাতিরে না হয় মানা গেলো মহম্মদ স্থূল দেহধারী হলেও পদার্থের গুণগত ভিন্নতার মতো তাঁর গুণগত মান ছিলো নূর। কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষায় নূর বা

আলোর গতিতে কোনো স্থূল দেহধারী ছুটতে পারে না, তথাকথিত ওই মান বা গুণই ছুটতে পারে। সে বিচারেও মহম্মদের স্বশরীরে মি'রাজ গমন বাতিল হয়ে যায়।
এরপর তিনি উপায়ান্তর না দেখে হাদিস হাতড়িয়েছেন। যেখানে মহম্মদ বলছেন, 'সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। ... আমি আল্লাহ্র নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর থেকে সৃষ্ট। সুতরাং বলা যায়, মুহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু নূরের তৈরি আর নূরের কোন ওজন নেই, সেহেতু তার পক্ষে আকাশ ভ্রমণ অসম্ভব বিরুদ্ধবাদীদের এই যুক্তিও ধোপে টেকে না।'

হযরত মহম্মদ যদি ওজনহীন নূরেরই তৈরি হয়ে থাকেন তাহলে বোরাক বা সে নামের নভোযানের প্রয়োজনটা হলো কী কারণে? অন্যদিকে কোরান মহম্মদকে পরিষ্কার রক্তমাংশের মানুষ বলেই ঘোষণা করে-

* বলো : আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ (৪১:৬)
* আমি তাদেরকে (প্রফেটদের) এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্যগ্রহণ করতো না এবং তারা (কেউ) অমরও ছিলো না (২১:৮)

অন্যত্র ২৮ সুরার ৮৬ আয়াতে বলা হচ্ছে : আর তুমি (মহম্মদ) এমনটা আশা করোনি যে, তোমার প্রতি এ গ্রন্থ (কোরান) অবতীর্ন হবে।' এখানে প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি পৃথিবী বা নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির আগেই নিজের সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তিনি নিজের কাছে সৃষ্টিকর্তার গ্রন্থ অবতীর্ণ করার বিষয়টা পূর্ব থেকে জানবেন না কেনো? যদি জানতেনই তাহলে কোরানে কী উপরোক্ত কথার বর্ণনা থাকতো? এবং কোরানের কোথাও উল্লেখ নেই, ঈশ্বর সর্বপ্রথম, আদমেরও আগে মহম্মদের নূর সৃষ্টি করেছেন।

আর সিরাজীর মতো ইসলামি অতিপণ্ডিতরা 'নিশ্চয় তোমাদের কাছে আল্লাহর নূর ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে' বলে মহম্মদকে উদ্দেশ্য করে কথায় কথায় কোরানের যে বাণীর উদ্বৃতি দেন, সে নূর বা আলো মানে ব্যক্তি মহম্মদকে বোঝায় না। আরবের তদানীন্তন অন্ধকার যুগে তাঁর আবির্ভাবকেই সম্ভবত বোঝানো হয়েছে। আমরা যেমন অশিক্ষাকে দূরীকরণ লক্ষে আজকাল বলি, 'আলোকিত মানুষ চাই।' এর মানে কী সত্যি সত্যি আলো বা নূরের মানুষ বুঝতে হবে? কোরানের সেই আয়াতটিও রূপক অর্থে এরকম উচ্চারণকেই বোঝায় (৩:৭)। আর নয়তো কোরানের শিক্ষাকে বলা হয়েছে নূর। বিজ্ঞানের থিওরি কপচে ওসব নূরটুরের কথা বলে কোনো মানবকে অতিমানব করে দেখাবার চেষ্টাকে মানুষ এখন স্রেফ পাগলামো হিশেবেই বিবেচনা করতে শিখেছে।

এ নিয়ে আলোচনা আর দীর্ঘ করা অর্থহীন। মি'রাজ বিষয়টি হযরত মহম্মদ জীবিত থাকাকালীন সময় থেকেই একটি বিতর্কিত বিষয়। ইতিহাসে একথা লেখা আছে। মহম্মদ যখন মি'রাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাক্ষাত লাভের কথা তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের কাছে প্রচার করেন তখন তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের একটি বিরাট দল এর বিরোধীতা পোষণ করে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একথা সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত কোরানের তফসিরে উল্লেখ আছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে: হাফেয ইবনে-হাজার আসকালনী তাঁর 'ফতহুল-বারী' গ্রন্থে মহম্মদের ভক্ত-শিষ্যদের এ মতবিরোধের উল্লেখ করে এমন কিছু উক্তি উদ্বৃত করেছেন যা দিয়ে মি'রাজ বিষয়ের বিতর্ক ও বিরোধের মীমাংসা হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, কুরতুবীর

মতে এ ব্যাপারে কোনো মীমাংসায় না যেয়ে নিশ্চুপ থাকাই উত্তম। কেনোনা মি'রাজ বিষয়টির সঙ্গে কোনো বাস্তবতা জড়িত নয়; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন।[১০]

তাই তো প্রাচীন কবি বলে গেছেন, 'বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর।' বিশ্বাসে কোনো যুক্তি নেই। আর যেখানে যুক্তি নেই সেখানে কথিত সত্য প্রশ্নবিদ্ধ। যেমন যিশুর স্বর্গগমন ও অদ্যাবধি তাঁর সেখানে বর্তমান থাকার বিষয়টি। ওটা নিছক বিশ্বাস। ধর্মীয় রঙিন বিশ্বাস। সত্য নয়। রূঢ়, কঠিন বাস্তব নয়। বিশ্বাস। স্রেফ বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের রঙিন দোলায় যিশুকে নিয়ে হাজার হাজার তথাকথিত অলৌকিক গপ্পের জন্ম হয়েছে। আজো হচ্ছে। তেমনি ঠিক একইভাবে হযরত মহম্মদকে নিয়েও আজো যে কোরানিক দর্শনের বাইরে অবাস্তব কেচ্ছাকাহিনীর জন্ম হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত তো উপরোক্ত আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

কোরানের ভাষ্যানুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় বা কাল আছে, তা পূর্ণ হওয়ার পরই তার মৃত্যু হয়। এবং কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন তাকে আবার পুনর্জীবিত করা হবে। সেই আলোকে যিশু সম্পর্কে কোরানের সুস্পষ্ট কিছু আয়াত-

> * ঈশ্বর বলছেন, 'হে যিশু, অবশ্যই আমি তোমার কাল পূর্ণ করবো'... ৩:৫৫।
> * যিশু বলছেন, 'আমার প্রতি শান্তি-যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আবার জীবিত হয়ে জেগে উঠবো' ১৯:৩৩।
> * ঈশ্বর বলছেন, 'মেরির পুত্র মসিহ একজন পয়গম্বর ছাড়া কিছু নয়। তার পূর্বে অনেক পয়গম্বর গত হয়েছে' ৫:৭৫।

একই সুরার ১১৭ নম্বর আয়াতটি সবচে' তাৎপর্যপূর্ণ যিশুর ক্ষেত্রে। এটিতেই সুস্পষ্টভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে যিশুর ভাষ্যে বলা হচ্ছে,

> '...আর আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তারপর যখন তুমি আমার দেহচ্যুত করলে তখন থেকে তুমিই তাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর তুমি সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।'

এখানে অত্যন্ত লক্ষণীয় শব্দটি হচ্ছে 'দেহচ্যুত'। এর অর্থ মনে হয় না খোলসা করে বলার কোনো প্রয়োজন আছে। আমার সংগ্রহের বিভিন্ন অনুবাদকের অনুদিত ১৭টি বাংলা কোরানের মাত্র একটি সংস্করণে উল্লেখ আছে এই 'দেহচ্যুত' শব্দটি। সেটি সর্বপ্রথম বাংলা অনুদিত কোরান। অনুবাদকÑ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। অনুবাদের জন্যে ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাঁকে 'ভাই' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর অনুবাদের বিপক্ষে আজো পর্যন্ত কোনো কোরান বিশেষজ্ঞ কোনো প্রশ্ন তোলেননি। ভাই গিরিশচন্দ্রের হুবুহু অনুবাদটি হচ্ছে,'... আমি তাহাদের মধ্যে যে পর্যন্ত ছিলাম তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী ছিলাম; পরে যখন তুমি আমাকে দেহচ্যুত করিলে তখন তুমিই তাহাদিগের সম্বন্ধে রক্ষক ছিলে, এবং তুমি সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।'[১১] উল্লেখ্য কোরানের ভাষ্যানুযায়ী একথাগুলো যিশু শেষবিচারের দিন ঈশ্বর সমীপে বলবেন।

কোরানের সুরা ৩ এর ৫৫ আয়াতে যিশুকে তুলে নেয়ার বিষয়ে যে 'মুতাওয়াফ্ফি' আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা 'তাওয়াফ্ফা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবিতে যদি বলা হয়-'তাওয়াফ্ফাল্লাহু ওয়াহিদান' তার অর্থ হবে- আল্লাহ ওয়াহিদের আত্মাকে উঠিয়ে নিলেন; অর্থাৎ ঈশ্বর ওয়াহিদকে মৃত্যু দিলেন বুঝতে হবে। যেখানে 'ঈশ্বর' কর্তৃবাচক হন এবং 'মানুষ' হয় কর্মবাচক এবং 'তাওয়াফ্ফা' হয় ক্রিয়া, সেখানে 'তাওয়াফ্ফার' অর্থ আত্মা বা রুহুকে তুলে নেওয়া বা মৃত্যুদান করা ছাড়া অন্য কোনো অর্থ কখনো হয় না। সমস্ত আরবি সাহিত্য ঘেঁটে এই শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহারের একটি প্রমাণও পাওয়া যাবে না। এ শব্দটি কোরানের বিভিন্ন জায়গায় মোট পঁচিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। তেইশটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে মৃত্যুর সময় আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে। কেবল মাত্র দু'টি জায়গায় (৬:৬০/৩৯:৪২) ঘুমের মধ্যে আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং সেই দু'জায়গায় 'ঘুম' ও 'রাত্রি' শব্দ দু'টি ব্যবহারের ফলে 'তাওয়াফ্ফা' বিশেষত্ব লাভ করেছে বলতে হবে। ইবনে আব্বাস 'মুতাওয়াফ্ফিকার' অনুবাদ করেছেন 'মুমিতুকা' অর্থাৎ- আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো (বুখারি-কিতাবুত্তফসির)। অথচ অন্যসব কোরান অনুবাদকরা কেউই শব্দ দু'টোর প্রকৃত অর্থ তাদের অনুবাদে ব্যবহার না করে-তুলে নেওয়া, উঠিয়ে নেওয়া, গ্রহণ করা ইত্যাদি সব শব্দ ব্যবহার করে রহস্যের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছেন যিশুর মৃত্যু বিষয়ে! একই স্থানে এম. পিকথলও তাঁর ইংরেজি অনুবাদে শব্দটি ব্যবহার করেছেন অন্যদের মতো; যার অর্থ তুলে নেয়াই বোঝায়।

কিন্তু অবাক করা সবচে' মজার ব্যাপার হলো, সৌদির বাংলা কোরানের তফসিরের কোথাও যিশুর মৃত্যুকে স্বীকার করা না হলেও সুরা ৫ এর ১১৭ আয়াতটি পরিষ্কার ভাষান্তর করা হয়েছে এভাবে (পৃঃ ৩৬৪)-

> 'অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন' ।

এই সেরেছে!! যিশুর অমরত্বের জারিজুরি সব ভেস্তে গেছে। এটা কী হলো? হাজার মিথ্যের পর্দা ফেলেও আসল সত্যকে ঢেকে রাখা গেলো না, সে ঠিক বেরিয়ে এলো। সম্ভবত এ জন্যেই যিশু বাইবেলে বলেছেন, 'এমন ঢাকা কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা জানা যাবে না।' এবং কোরানের ঈশ্বর বলছেন, 'আকাশে ও ভূমিতে এমন গোপন কোনো বিষয় নেই যা এই সুস্পষ্ট শাস্ত্রে না আছে' (২৭:৭৫)। এখন বাংলা 'লোকান্তরিত" শব্দের অর্থ কী 'পরলোকগত' বা 'মৃত' থেকে বদলে অন্য কিছু করা হবে যিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে; তাঁর অমরত্বের জন্যে? কিন্তু তাও সম্ভব না। কারণ কোরানে ঈশ্বর মহম্মদকে বলছেন,

> 'আমি তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করিনি; সুতরাং যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে কী তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে' (২১:৩৪)?

এরপরও যিশুকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে ওয়াদা ভঙ্গকারীর অভিযোগে ঈশ্বরকে কী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় না?

তথ্য নির্দেশ :

১. বাইবেল, ১ কোরিন্থিয়ান্স ১:২০-২৩
২. মাথিউস ১০:৩৪-৩৮/লুক ১২:৫১, ১৪:২৬
৩. মাথিউস ১০:৩৯
৪. লুক ১২:২-৩/মাথিউস ১০:২৬
৫. বাইবেল, কোরান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সা'দ উল্লাহ্, সময় প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ০২.২০০০। পৃঃ ১১৮।
৬. মিথ্যা বিনাশী হযরত ঈসা (আঃ), রফিকউল্লাহ্, মল্লিক ব্রাদার্স, কলেজ ষ্ট্রিট, কলকাতা ২০০১। পৃঃ ৫৯
৭. The Bible The Qur'an and Science, Maurice Bucaille, Translated from the French by Alastair D. Pannel Crescent Publishing Co, Delhi-110006, 1985, P.242-248
৮. কোরান ১৭:১/১৭:৬০/৫৩:১৩-১৮
৯. দৈনিক বাংলার বাণী ১৮.০৬.১৯৯৫
১০. পবিত্র কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসির), সৌদি বাদশাহ্ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজীজ কর্তৃক সৌদি থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ১৩০৬
১১. কোরআন শরীফ, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭, ১৮২৯ শক.। পৃঃ ১৩৭

ডাঃ ওয়াহিদ রেজা বাঙলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।